KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : ৩৩/২ এ. বীরেন সেন সরণী, কল-৫
Collection : KLMLGK	Publisher : মহাশ্বেতা সান্যাল (1, 2) অভিরূপ সান্যাল (2/1)
Title : অ (A)	Size — 8.5"/5.5"
Vol & Number : 1 2 2/1 2/3 3/1	Year of Publication : Aug 1981 Nov 1981 Aug 1982 Feb 1983 Aug 1983
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : অভিরূপ সান্যাল	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

সাহিত্যের ভরা নদীতে জোয়ার। অন্ধকার; অথচ আলোর ইশারা। ছোট ডিঙি বেয়ে 'অ'। হাওয়া দিচ্ছে বেগে। না গেলে চলত তবু চলল না। শুধু ভেসে থাকা নয়; নয় শুধু বেঁচে থাকা। ছোট দাঁড় বেয়ে এগিয়ে চলা—যেখানে আলোর উৎসারণ। রামধনু! আকাশ যেখানে পৃথিবীকে ছোঁয়। রৌদ্রে সবুজের গন্ধ। ভূতকালের ভূতেপাওয়াদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পেরিয়ে। আরো দূরে। অনেক দূরে॥

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অ

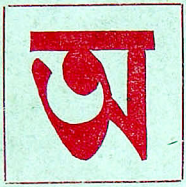

লিখেছেন

আলেকজান্দার ব্লখ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, রসুল গমজাতভ, রণেশ দাশগুপ্ত, রাম বসু, অনিলেন্দু চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তি হাজরা, শুভ বসু, বিপ্লব মাজী

অমল আচার্য, সিদ্ধার্থ বসু, অঞ্জনা গুহঠাকুরতা, নন্দিতা সেনগুপ্ত, সর্বেণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী সিংহ, দেবনাথ বসু, জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ সান্যাল, শতরূপা সান্যাল, মহাশ্বেতা সান্যাল

সম্পাদিকা: শতরূপা সান্যাল

প্রথম সংকলন
আগষ্ট ১৯৮১

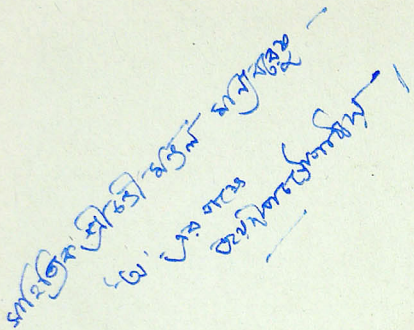

সাময়িকী প্রাচী-মণ্ডল মান্যবরেষু।
'অ'-এর পক্ষে
অমল আচার্য।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
* কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

গল্পকারদের সংকট এবং কেন

অমল আচার্য

গল্পকাররা কিন্তু সবথেকে বেশি সংকটে পড়েছেন, বিশেষ করে তরুণ গল্পলেখকরা। সময় হল ঔপন্যাসিকদের, অবিশ্যি সবসময়ই সেটা ছিল। যাঁরা রগরগে উপন্যাস লেখায় পাকা, তাঁরা তো এক কথায় সুপার স্টার। বাপের একমাত্র মেয়ে-জামাই যেমন আদর পায়, প্রকাশকরা তেমনি তাঁদের যত্ন-আত্তি করেন। তা করুন।

কবিদের ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এ কথা ঠিক, তাঁরাও প্রকাশকদের কাছে তেমন পাত্তা পান না। কিন্তু তাঁরা অন্যভাবে পুষিয়ে নেন। কবি-সম্মেলন বা কবিতা পাঠের আসরের মাধ্যমে, তা সরকারী বা বেসরকারী যে স্তরেই হোক না কেন, তারা যথেষ্ট হইচই করতে পারেন, করেও থাকেন অনবরত। ফলে তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ, মন জানাজানি, সহমর্মিতা এবং সাংগঠনিক মনোভাব গড়ে ওঠে, যা তাঁদের আশ্রয়হীনতার হতাশা অনেকটা কাটিয়ে দেয়।

গল্পকাররা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন, আমার ধারণা। এক, প্রকাশকরা তাঁদের প্রতি অমনোযোগী। দুই, তাঁরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন।

আদতে গল্পগ্রন্থ ছাপাতে কোমরে জোর-অলা প্রকাশকরা আদৌ আগ্রহী না। চুনোপুঁটিরা তো স্ট্রাগল্ ফর একজিস্টেন্সে নিরত। তবু তাঁদের সাহস আছে, মাঝে মধ্যেই রিস্ক নিয়ে নেন গল্পবই ছাপাবার। বড় প্রকাশকরা হাফ সেনচুরি, সেনচুরি, সোয়া সেনচুরির উপন্যাসকারদের গল্পগ্রন্থ একাধিক ছাপাবার দরদ বা মুরোদ দেখানোয় সাহস পান না যেখানে। কেন?

প্রকাশকরা তো একটার পর একটা উপন্যাস ছাপিয়ে চলেছেন, তো গল্পের বই ছাপাচ্ছেন না কেন? তাঁরা তো ব্যবসা করতেই নেমেছেন, আর প্রায় সকলে করছেনও চুটিয়ে। হাজার হাজার টাকাও লগ্নী করছেন। তবে কেন গল্পগ্রন্থ প্রকাশনায় অনীহা?

তরুণ গল্পলেখকদের কথা বাদই দিলাম। এমন বহু গল্পলেখক আছেন, যাঁরা দুই বা আড়াই দশক ধরে অসামান্য সব গল্প লিখে আসছেন, সাহিত্যের বসতবাটিতে যাঁদের স্থায়ী ঘর হয়ে গেছে, তাঁদেরও একটি বা দুটির বেশি গল্পসংকলন বেরলো না, বেরলেও যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, এরকম কেন হয়?

মানে এই দাঁড়ায়, গল্পের বই কি তাহলে বিকোয় না? আর যদি না বিকোয়, কেনই বা তার পেছনে টাকা ঢালা হবে? টাকা কি গাছে ফলে? হয়ত এই কারণেই প্রকাশকরা গল্পের বই পারত পক্ষে ছাপাতে চান না।

তাহলে কি এই দাঁড়াল, গল্পের পাঠক নেই? দেখেশুনে তো মনে হয় অনেক আছে। যদি থাকে, পাঠকদের কাছে, যেমন উপন্যাসের আছে, গল্পগ্রন্থের চাহিদা নেই কেন? তাঁদের যদি চাহিদা থাকত, গল্পের বই যদি উপন্যাসের মতই বিক্রি হত, প্রকাশকরা অবশ্যই ছাপাতেন। কারণ তাঁরা কারবারী, টাকা উড়িয়ে টাকা লটকাতেই কারবারে নেমেছেন।

এই সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয়, প্রকাশকদের সাতখুন মাপ। সমস্ত দায়িত্ব তাহলে পাঠকদের ঘাড়ে এসে চাপে। পাঠকরা হয়ত বলবেন, তেমন গল্প লেখা হচ্ছে কই? কিন্তু এ প্রশ্ন ধোপে টিকবে না। কারণ ভালো গল্প প্রায়ই লেখা হয়, লিখছেন গল্পলেখকরা। বরং সেই তুলনায় অধিকাংশ উপন্যাসই গোঁজ ঢুকিয়ে পাকানো কাঁঠালের মত ভুষিমাল।

আসলে এটা মর্জির কথা। মর্জি তৈরী হয় মেজাজ থেকে, আর মেজাজের মূল মানুষের জটিল মনোভূমি। মানুষ নিজেকে খুঁটিয়ে-নাটিয়ে, উলটে-পালটে, মিলিয়ে অমিলিয়ে দেখতে চায়, পেতে চায়, উপলব্ধি করতে চায়—যা উপন্যাসে সম্ভব, ছোটগল্পে নয়। কারণ ছোটগল্পে তার সুযোগ কম। সেই জন্যেই কি তবে উপন্যাসের এত চাহিদা?

ঘুরেফিরে আবার সেই প্রশ্নই এসে যায়। তাহলে মানুষ গল্প পড়ে কেন? লেখে কেন? এটা এক দুরন্ত রহস্য। এই রহস্য সমাধানের মধ্যেই গল্পকারদের সংকট মোচনের সূত্র রয়ে গেছে, নিশ্চিত।

ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা—

হাসান নাসিরের স্মরণে

উর্দু থেকে অনুবাদ : রণেশ দাশগুপ্ত

ওরে দেশ প্রিয় মোর তোর ভাবোন্মাদ আর্তিকে সালাম
ওরে জন্মভূমি তোর ছিন্ন-ভিন্ন কন্থাকে সালাম।

সত্যের যে পথ তোর রক্তে ও ধূলায় মাখা তার শুভ হোক
ওরে মোর পুষ্পোদ্যান তোর রক্তক্ষরা ক্ষত সুখী হোক।

উৎসন্ন হয়েছে যত গৃহ, জনহীন, আলোছায়া তাদের সালাম
ধূলায় পেতেছে ডেরা যত গেহ ভেঙে সারা তাদের সালাম।

অন্যায়ের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে যারা হতবাক তারা জয়ী হোক
অশ্রুসিক্ত চোখে চোখে যে প্রদীপ্তি তার শুভ হোক।

এ বিশ্বের সব দুঃখ মুছে গিয়ে যত দিন না আসে জোয়ার উৎসবের
পয়মন্ত ইতিহাস শোকের উৎস এই বহমান সঙ্গোপনে থেমে যাক।

কারও মুক্তি না আসুক সকলের মুক্তির আগে
সকলের সাথে সাথে গচ্ছিত শোকের ভাণ্ডার থেকে যাক।

তোর পথযাত্রী যারা জীর্ণ পদ, থাক পথহারা
কাঁটার মুখের রক্তে যে শোভা-দীপ্তি আছে তার—শুভ হোক

তোর লাগি নিবেদিত প্রাণ যারা, থাক শান্তিহারা
ফাঁসী মঞ্চে বিরহে যে জ্বালা আছে, তার শুভ হোক।

হাসান নাসির ছিলেন হায়দ্রাবাদের মানুষ। বিদ্বান, শিল্পীমনা ও বিপ্লবী। পাক জেলখানায় তাঁকে হত্যা করা হয়। স্বদেশ থেকে সুদূরে স্বনির্বাসিত কবি ফয়েজ তাঁকে ভোলেন নি।

আলেকজান্দার ব্লখ-এর কবিতা—

অনুবাদ : তরুণ সান্যাল

তরপেট

বড় নিষ্ঠুর কষ্ট দিয়েছে ওরা
এমন কি কাঁচা দিবাস্বপ্নের চূড়ায়
ক্লান্ত এমন, জীবিত ছিল না কেউ
সাদা দুর্বল পাপড়ি চটকে যায়

বসেছে এখনি সালোঁয়, ডিনার ঘরে,
তরুণী এবং জরতী নারীর হাট—
রং-চটা এই সোসাইটি ডিনারের
মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ-বিভ্রাট

টেবিলে টেবিলে মোমবাতি জ্বলে, আর
হলদে বৃত্ত প্রতিটি মুখাবয়বে
আলাপের পার্চমেন্টও খসখসায়
বুদ্ধির ঘট মাত্রা ছাড়ালো সবে

যে-পরিতৃপ্ত, দেখি বিরক্তি তারই—
ভরা পেটে ভীত শঙ্কিত ভূটভাট
জাবনার চাড়ি উল্টে দিয়েছে কারা
গোয়ালে ঘুচলো নিখাদ রাজ্যপাট।

জীর্ণ হৃদয় পায় না শান্তিটুকু
আকাশ আকুল ঝোড়ো মেঘে থই-থই
যেন প্রস্তুতি অস্ত্র ঝনৎকারে
দেবতাকে ডাকো—কে আছেন তিনি বৈ॥

২৩ ডিসেম্বর, ১৯০৮

ব্যবহৃত—ব্যবহৃত

রাত্রি, একটি পথের বাতি, একটি ফার্মাসী
অর্থহীন ধোঁয়ামলিন আলো
এক শতকের সিকি অংশ এমনি চলে যায়
কোথাও কিছু একটু-না বদলালো।

মরো, এবং যাও চলে যাও ফের উৎসে ফিরে
আগের মতোই ভাগ্য হবে একই
রাত্রি, খালে কালো জলের ছলাৎ মৃদু ঢেউ
ফার্মাসী সেই, বাতিটি সেই, রাস্তাও এক দেখি।

অক্টোবর ১৯১২

কবির সময়

প্রথমে রমণী ঠাট্টা করলো, আর
শেষে জ্ঞান হলে নীরব ভর্ৎসনায়
সুন্দর মাথা না মেনে নাড়ায় তার
দুটি চোখে জল মোছে মোছে, মুছে যায়।

এবং হাসলো, খুশি ঝিকিমিকি হাসি,
সব কিছু যেন ঝেঁটিয়ে পায়ের হাঁটা,
কেন-যে হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো কেঁদে
টেবিলে খসলো চুলের দশটি কাঁটা

দ্রুত পায়ে চলে যেতে যেতে, থেমে পড়ে
ফিরে আসে, ভাবে মাথা ঠাণ্ডাই আছে,
হঠাৎ আমার দিকে পিঠ ফিরে, চটে
চলে যায়, কোনো দিনও আসবে না কাছে।

ভেবোনা, যা কাজ সে সবে হবেনা খুঁত
এ আমার কালে কবির নিজেরই ব্রত,
বেঁচে থাকা সে-কি হাওয়ায় নিছক ধ্বনি
শুধু খসখস, যায় গাউনের মতো ?
২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬

চিরায়ত রণ। রক্ত ধুলায় মেখে
শান্তি—স্বপ্ন প্রায় !
স্তেপিতে ছুটছে মত্ত ঘোটকী বেগে
তৃণ ক্ষুরে দলে যায় !

[ব্লক (১৮৮১-১৯২১) অভিজাত সংস্কৃতির শূন্য নিরালম্ব লোক থেকে এসেছিলেন বিপ্লবের পক্ষে। সিম্বলিস্ট কবি। 'সুন্দরী' ও 'গোলাপ' যাঁর ছিল প্রতীক। তিনি দুঃখী মানুষদের পাশে এসেছিলেন শিল্পের নিজস্ব দাবিতেই। কেননা জীবন যে শিল্পের চেয়ে ঢের বড়ো, মহামহীয়ান এবং বিপ্লবও এক শিল্প।]

রসুল গামজাতোভের কবিতা—

শ্রাবণ রাতে

অনুবাদ : তরুণ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ রাতের এ ঘোর অন্ধকার
জেনো কেটে যাবে কালকে সুনিশ্চয় !
ঘুমাও ঘুমাও হে প্রিয় আমার, আর
শোনো গাই গান, হৃদয়ে রেখোনা ভয়।

ফিস ফিস করে কথা বলে ওরা—কারা ?
বুঝিবা বাতাস, কিংবা ছায়ার ভুল।
যাবার বেলায় আছিলে বাক্যহারা
জানালে 'বিদায়' মনে আছে বিলকুল।

তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে-বা কে
তাই আমি জাগি সতর্ক পাহারায়।
কাটুক আঁধার ভোরের পাখির ডাকে
—ঐ শুকতারা পুব আকাশের গায়।

সংঘাতের কাল

রাম বসু

সংঘাত এখন তীব্র
বোধ যেন হাল-দেওয়া মাঠ
ধুলো ছাড়া কিছু নেই হাতের মুঠোয়।

কখনো ঘুমের ঘোরে টের পাই সাদা বাড়ি
জ্যোৎস্নার বনের ভেতর
ঝর্ণা আর হরিণের সহচর হওয়া
কপালে নরম হাত রাখে।

নোনতা গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়।

জন্ম ও মৃত্যুর কথা জীবনের অথৈ রহস্য অনায়ত্ত
হাতে যত কাজ ছিল হ'ল না একটিও
কেবল মুখের কাছে অলৌকিক কলের মতন
পূর্ণিমার চাঁদ

সমস্ত সংঘাত নিয়ে পাথুরে খাঁড়িতে বসে
চেয়ে দেখি—আছে ; পূর্ণিমার চাঁদ
চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে।

আজ বসন্ত

অনিলেন্দু চক্রবর্তী

এ বসন্ত খাঁচাবন্দী ! মঞ্জরীলুণ্ঠন
যুগের কোকিল সিঁড়িভাঙা আর্তনাদ তোলে,
সুন্দরী বকুল হুজুগি হাওয়ায়
নর্দমায় প্রসাধন-ব্যস্ত,

প্রান্তর ঝলসানো বুকে চিৎ হয়ে আছে ঃ
অন্তিম জবানবন্দী লিখে যায় আকাশ-ঈশ্বর।
দক্ষিণা বাতাসে মুহুর্মুহু নাভিশ্বাস
মেদক্ষীতা মলয়ার,
পাশে তার কিশোরী আকাঙ্ক্ষায় স্বর্ণকুঁড়ি—
উলঙ্গ হয়েই পূর্ণতা প্রসব করে……
আজ বসন্ত।

আলো

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ফ্রেম ভেঙে যেই বাইরে দাঁড়ালে,
রঙের পাগল বন্যায়
রেখার জোয়ারে হু-হু ভেসে গেল
গৌরী মুখের খরটান,
রিবনের লাল লাফ দিয়ে উঠে
রক্তে ভাসাল মাঠঘাট,
টিলায়, সাগরে, উপত্যকায়
ঝল্‌সে উঠল হীরে ধার।

ঐ-আলো আমি দু'চোখে ছোঁয়াবো
সারি সারি জন্মান্ধের,
খঞ্জের পায়ে ছন্দ জাগাবো
নেবো ঘর থেকে বাইরে,
মৌন নবীন মুখরতা পাবে
ছুটে চলে যাবে খরশান
ফ্রেম ভেঙে তুমি বাইরে দাঁড়ালে
রঙের পাগল বন্যায়।

আকাশ

শক্তি হাজরা

সেও ভালো যদি আকাশে ঘনায় মেঘ
গাঢ় নীলিমায় তোলে কালকূট ফণা,
তবুও বুকের সবখানটুকু জুড়ে
থাকুক আকাশ—অশেষ উদার আকাশ।

কিংবা কখনও বৈশাখে ধূ-ধূ রৌদ্রে
পুড়ে কালো হয় শ্যামল অঙ্গ আমার
তবুও বুকের সবখানটুকু জুড়ে
থাকুক আকাশ অশেষ উদার আকাশ।

কুমোর

শুভ বসু

মূর্তি গড়ো। হাতের গোপন চাপে
চোখের ওপর অহংকারী ভ্রূ-এর অক্ষমা,
সমস্ত মুখ মমতা আর
বজ্রমানিক হীরার গোপন দ্যুতি,
দুই ঠোঁটে
দুই পাপড়ি অভয়, রুধির লিপ্সা।

অনেক রাতের নিদ্রাহরণ ধ্যান
তোমার হাতের মাটিকে দেয়
স্নায়ু অনেক সাধের
ভংগী সহজ অহংকারে, প্রেমে,
যখন ঠিক মূর্ত তখন তোমার ধ্যানের জয়।

কয়েকটা দিন সেই প্রতিমার
মায়ায় জমে উৎসব, আলো, পুজাঞ্জলি।
কয়েকটা দিন। তারপরেই তো বাতাস জুড়ে
নিরঞ্জনের বিষাদ-লাগা ঢাকের রুদ্ধবাক।

নূতন করে আবার আরেক
মূর্তি গড়ে তোলা।

সারা জীবন মূর্তি গড়া চলে!

দুটি কবিতা—

বিপ্লব মাজী

১ ভালোবাসার
একটিমাত্র বাতাস
আমাকে এখন স্পর্শ করে

যা আসে তোমার
হৃদয়ের নক্ষত্র আর সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে

আমি স্নাত হই
ঐ একটিমাত্র বৃষ্টির ভেতরে

যা আসে তোমার আকাশবাতাস
আর্দ্র করে

ভালোবাসার একটিমাত্র বাতাস
আমাকে এখন দোলায়
তোমার কাছে পৌঁছে যেতে॥

২ বৃষ্টি এল
শহরে

নববধূ আসা
উৎসবের আমেজ নিয়ে……

ধুলোর গন্ধেও
ম ম করছে তার মনের সংপৃক্ত
অনুরাগ

দুরান্বয়ে
মিলিয়ে গেছে ঝড়ের পূর্বাভাস

বৃষ্টিস্নাত
শহর

ক্রমেই ডানা নাড়ছে
পরীর মত

আমার
মনে হল:
এই বৃষ্টি কতকাল ভালোবাসি

ভালোবাসব
যতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে রোমাঞ্চে জীবন।

শিউলির দিন আসেনা

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

শুধু স্বপ্ন দেখে দেখে কি দিন যাবে তার?
শীত গেল এসে।
রাস্তাঘাটে সাদা পাইন কোথা পাবে?
তবু অন্যতর সন্ধান এক সুদূর ঝর্ণার জলে।
কুয়াশার চাদর সরে। ধান ক্ষেত জাগে।
ভাবে সে—জাগে কি?

শুধু স্বপ্ন দেখে দেখে কি দিন যাবে তার?
শীত গেল এসে।
স্বপ্ন শেষ; এবার কি নির্বাসন তবে
বিদেশী সৌরভে?
স্বপ্ন ভেঙে উঠতে হয় তো নিজেকেই।
ভাবে সে—হয় কি?

শুধু স্বপ্ন দেখে দেখেই কি দিন যাবে তার?
শীত গেল এসে।
সাদা চুল বুড়ি রোদে পিঠ দিয়ে ভাবে
সব তো ঠিকই আছে 'যৈবন গেল কুথা?'
হু হু বয় হাওয়া। সাগর সৈকতে
শিউলি ফুল হাতে কিশোর দাঁড়িয়ে থাকে
কিশোরী আসে না।

বসন্ত ও একটি প্রাণ

মৌসুমী সিংহ

জীবন যখন ক্লান্ত একটানা চাকার ঘূর্ণনে
দক্ষিণের সব কটি বাতায়ন দৃঢ় বলে আঁটা
রাজপথ পার্শ্বে দেখি মুকুলিত কৃষ্ণচূড়া গাছ
যার তল দিয়ে রোজ অবসন্ন দেহ নিয়ে হাঁটা—।

হঠাৎ সেদিন দেখি তার তলে উৎকণ্ঠ যুবা
সরল কোমল মুখ কী আগ্রহে প্রতীক্ষায় রত
মনে এল অতীতের বাসন্তী দিনের মৃদু আভা
এক ঘেয়ে নিত্যতার এক কোণে অভিমানে নত।

আরও কিছুদিন পরে ঐ পথে সে কী ভিড়ে ভিড়—
বোমার আঘাতে কোন তরুণ যুবক গেছে মারা
গাছের তলায় লাল রক্ত আর বীভৎস শরীর
চতুর্দিকে ছেয়ে আছে বিকালের যুবা কৃষ্ণচূড়া।

গোধূলির সূর্য ডোবে লাল রূপ ধরে আশমান
কৃষ্ণচূড়ায় ওড়ে স্তরে স্তরে অনল নিশান॥

দুটি কবিতা—
শতরূপা সান্যাল

অসময়

মৃত সরীসৃপ যেন চারিদিকে শীতলতা ধু-ধু
থমথমে নিস্তব্ধতা নিঃসঙ্গতায় আরও গাঢ়—
ক্ষুধার্ত বাঘের জিহ্বা উদ্যত লোলুপ স্বার্থপ্রায়
প্রসব যন্ত্রণা হয়ে ধরিত্রীর ব্যথা বাড়ে আরো।

তামাটে আকাশ কই উষ্ণ মুখে আশ্বাস দেবার?
কুণ্ডলী পাকায় সাদা কালো রঙে মৃত মানুষেরা
কৃপণের মহাদান লণ্ঠনের মৃতপ্রায় আলো
রৌদ্রেরও প্রবেশ পথ রক্তছেঁড়া কাঁটাতারে ঘেরা।

গ্রীষ্মদিন

পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতায় ভ'রে ওঠে নিদাঘের তাপদগ্ধ বেলা
বটের ছায়ার মত শীতলতা কোলে টেনে নেয় যেন স্নেহে
মুক্তাবিন্দু ঝরে পড়ে হাজার হাজার রোমকূপ ভেদ করে—
বর্ষার শেষের আলো ঘাসেদের স্নান করা সুকোমল দেহে।

ভেজা গাছ মাটির সুগন্ধভরা অজাত তন্বীর মত দিন
পাকা বকুলের ফল আগামীর সুকান্ত প্রজন্ম প্রতিশ্রুতি
হলুদ বাদামী পাতা ছেয়ে ফেলে রাধাচূড়াদের তলগুলি
বিকালের আধফোটা যুঁইয়ের মালায় যন্ত্রণার কী আকুতি!

পায়রার বুকের মত নিটোল উষ্ণ দিন সারি দিয়ে আসে
প্রতি কোষে অনুভব করি সবুজের উষ্ণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন
নিষ্ফলা আমের গাছে রোঁয়াহীন পাখির শিশুরা জন্ম নেয়
কাল-বৈশাখীর বুকে স্থির হ'য়ে থাকে আশমানী শুভক্ষণ।

নিটোল এক সূর্যোদয়

অঞ্জনা গুহঠাকুরতা

তোমাকে বলেছিলাম,
আমার এক সূর্যোদয় তোমাকে উপহার দেবো।
বনরাজিনীলার উপরে জেগে ওঠা
নিটোল গোল সূর্যতরুণ!
আজ বনে কুয়াশা
সেই স্বপ্নিল মন, ভাঙা আশা,
সুড়িপথে উইপোকার বল্মীক,
এ সব দেখে
সে প্রতিশ্রুতির কথাই মনে পড়লো!
অথচ,
সবই তো এখন বদলে গেছে,
সেই সূর্য এখন কটকটে লাল,
তার ক্রুদ্ধ চোখের দিকে তাকানোও যায় না।
সব প্রতিশ্রুতিই বোধহয়,
একসময় অবাধ্য হয়ে যায়,
অধৈর্য হয়ে খুঁজে নেয় সূর্যাস্তের পথ।

অশ্রুমতী

নন্দিতা সেনগুপ্ত

অশ্রুমতী, এই ঘাটে বোস।
বিকেলের রোদ মরে গেছে ঢের আগে
এখন পড়ন্ত বেলা শঙ্খ-হিম পাখীদের ভীড়, আকাশ গভীর।
শুধু দেখি তোমার দু'চোখ যেন প্রতীক্ষ প্রদীপশিখা স্থির।
পড়ন্ত বেলায় এই আনমনে ঘাটে এসে বসা,
গোধূলি আসন্ন লগ্নে রাত্রির নিঃশব্দ চোখ সতর্ক প্রহরী
শান্ত চোখে চেয়ে থাক নতমুখী নক্ষত্রের দিকে,
হেমন্তের শিশির ঝরুক,
তুমি শুধু তাকে মনে রেখ, যে তোমাকে চিরকাল মনে করে রাখে।

কমলিকা

দেবনাথ বসু

এক

দুধ নিয়ে ডিপো থেকে বেরুবার মুখে কৌশিকের সঙ্গে দেখা। এটা অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু সেদিন ব্যাপারটা হলো একটু ভিন্ন স্বাদের। কৌশিক দুধটা নিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। দুটো কেক আর দুটো চা বলে বসল। ভোর ভোর এ হেন বদান্যতায় অবাক না হয়ে পারলাম না। কৌশিকের পকেট ওয়াটার প্রুফ। জল গলে না। কার মুখচন্দ্রমা-দর্শনহেতু সকালে এই অযাচিত প্রাপ্তিযোগ তার হিসোবটা করছি; আচমকাই প্রায় কৌশিক জিজ্ঞাসা করল, "তুই নাকি প্রেম করছিস?" প্রেম? খাবি খেলাম। আমি প্রেম করছি? হ্যাঁ চেষ্টা যে করিনি তা নয়। প্রেমে পড়ার মতো কলার খোসা এ শহরে সর্বত্র শ'-এ শ'-এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নির্বিঘ্নে বহু ছেলেই হড়কাচ্ছে। কিন্তু আমার ধরণধারণ কিঞ্চিত আলাদা। আমি আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একেবারে এলেবেলে। বিশেষতঃ এ ধরণের কানামাছিতে তো একেবারে দুধেভাতে। আমায় দেখলে বহু লোকেরই অদ্ভুতভাবে বাৎসল্য রস মাথা চাড়িয়ে ওঠে। বন্ধুবান্ধবরাও বাদ যায় না। অনেকটা ছোট ছেলেকে চিবুক ধরে চুমো খাবার মতো। একবার একটা কবিতা লিখেছিলাম বলে আমায় বাসস্ট্যাণ্ডে কানধরে উঠবোস করিয়েছিল বন্ধুবান্ধবেরা। মেইন্ রোডে পেচ্ছাপ করার দায়ে পুলিশকে ঘুষ দিয়েছিলাম বলে ডায়মণ্ডহারবার বেড়াতে নিয়ে গিয়ে আমায় প্রায় ঘণ্টা ১৫ হিসি করতে দেওয়া হয়নি। এধরনের টুকিটাকী শাসন করুণায় আমার গায়ের চামড়া মোটা হয়ে গেছে। এখন সবই গা-সওয়া। তাছাড়া বর্তমানযুগে মেয়েরা প্রেম করার ব্যাপারে যে টেণ্ডার দেয় তার প্রধান 'চারিটি শিরোনামা' হল—সুদর্শণ, বিদ্বান্, ফার্ণেসের মত পকেট, আঁতেল। আমার বাবা বিয়ে করেছিল। আর তাই একটা বেলজিয়াম গ্লাসওয়ালা আয়না দিয়েছিল বাবার শ্বশুর। তাতে মুখ দেখলেই বুঝি যে প্রথমটি বাতিল। পরীক্ষার সার্টিফিকেট গুলো দ্বিতীয়টিকে বক্ দেখায়। আর তৃতীয় ও চতুর্থ, দুটোই চিন্তার বাইরে। তেলতেলে ব্যাপারটা আমার চিরকালই খারাপ লাগে। সুতরাং

একথা সুস্পষ্ট যে আমি একজন প্রথমশ্রেণীর ক্যাবলা। I. S. I. এর ছাপ দেওয়া কোয়ালিটি। সুতরাং প্রেম করবার ব্যাপারে আমিও অবাক না হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞাসার সুরেই বল্লাম "এ খবরটা ঝাড়লি কোত্থেকে?" "যেথান থেকেই ঝাড়ি। খবরটা টু। নাম কি? নাম? কি নাম বলব? প্রতিবাদ করলে যখন বিশ্বাস করবে না? তখন প্রতিবাদ বৃথা। সবটাই মিথ্যে দিয়ে ভরাব। এতদিন নেচেছি। এইতো নাচাবার সুযোগ।

"কমলিকা।" অদ্ভুত অনায়াসে বেরিয়ে এল। জানিনা অবচেতন মনের কোন গহন নিবিড়ে ঐ নামটা ওঁৎ পেতে বসেছিল।

"থাকে কোথায়?"—প্রশ্নটায় ঘাবড়ালাম। একটা মিথ্যে ঢাকতে আরেকটা। তেমনই অনায়াসেই বের হল, "বরানগরে, আমার মামাবাড়ীর পাশে।" কি অদ্ভুত এই মন। কত কিছুই আমার অজান্তে গোছগাছ করে রাখে। ভাঁজভাঁজ পাট করা মিথ্যে। অথচ কি সাবলীল।

"বরানগর থেকে বাঙ্গুরে আসে প্রেম করতে? শালা এলেম আছে।"

"বাঙ্গুরে?"

"সেদিন তো সন্ধেবেলা তেমনটাই দেখলাম। মনে হচ্ছে খুব অবাক হলি?"

"না অবাক হ'ব কেন? লেক্‌টাউনে পিসির বাড়ী।" সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। আমার সাবলীলতায় আমারই সমস্ত হিসেব গুলো গুলোচ্ছে। ঘাম দিচ্ছে। এ ধরণের প্রশ্নের জন্য আমার মাথাটা যে প্রস্তুত ছিল এটাই তো আশ্চর্যের। এনিয়ে ভাবার প্রকৃত কারণ আদৌ ঘটেনি। কি করে ঘটবে। আমি তো মানসিক ভাবে কিছুটা পঙ্গুই ছিলাম। তবু মন কিন্তু নিজের কাজ করে গেছে। একটি বারও জানান্ দেয়নি। কি সাবলীল ভাবে সাজানো সব চিন্তা। কবে কোন্ শুভক্ষণে এচিন্তা আমার মাথায় একটু একটু করে বেড়েছিল ভাবছি, কৌশিকের আবার প্রশ্ন, "দেখতে কেমন?" ওর বলার ধরণটা বেশ আন্তরিক। দেখতে? তাইতো? কেমন? ভালোই? না সুশ্রী। কিংবা বেশ। কি অদ্ভুত প্রশ্ন। কাউকে বিচারের ক্ষেত্রে তার রূপটা বিংশশতকে সবচেয়ে কম জরুরী, তা এরা বুঝল না। এটা একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট এটাও ওরা মানল না। বেচারা। ভেনাসের নগ্নিকা ছবি দেখে মন জুড়োক আর হা-পিত্যেস করুক। "বেশ ভালোই।" জবরদস্ত মেজাজে ছাড়লাম। অস্পষ্ট উত্তর। তবু কৌশিক চুপ। দুজনেই উঠে পড়লাম।

দুই

দিন যাচ্ছে। ওদের মনের আনাচে কানাচে জমাট বাঁধা বন্ধুদে ঠাসা। আলাপ করবার অনুরোধে যখন আমি মুহ্যমান ওদের মনে তখন থেকেই সন্দেহের হাওয়া লাগে। কেউ বলে, "ব্যাপারটা পুরোটাই ঢপ্। ডু-নম্বরী।" আবার কেউ এতেও সন্তুষ্ট নয়। বলে, "দর তুলছে। শালা ঝাড় খাবে একদিন।" কেউ কেউ বিশ্বাসটা ভাঙ্গছে না। হাজার হোক চাক্ষুষ দর্শন। তারা বলে, "আলাপ করাবে কিরে? কোথাকার রেণ্ডী মেয়ে।" বেচারা কমলিকা। বিনাদোষে কত সম্মান পেয়ে গেল। ওদের চোখে প্রেমিকা মানে বাদামভক্ষণ সঙ্গিনী আর আলাপ করার স্পেসিমেন। আমিও তেমনটাই ভাবতাম। এখন ভাবিনা।

কমলিকা আমার সব। চেতনায় সে আদি, প্রেরণায় অনন্ত। সে প্রাণটার মত সৌখীন, নিশ্বাসের মতই নিত্যনৈমিত্তিক, দৃষ্টির মত স্বচ্ছ, হৃদয়ের মত মুখর। বিগত দিনে যে ছিল হাসিতে-কৌতুকে-ঠাট্টায়-গালাগালে আজ তার অস্তিত্বটুকুকে টের পাই। কমলিকার প্রথম আগমনটা ছিল উত্তেজনার। আমার কষ্ট হতো। বলতাম, "ফিরে যাও কমলিকা। তুমি চিন্তায় সত্যি। বাস্তবে মিথ্যে। তোমায় আমি চিনি না। তুমিতো কমলিকা নও। ওকে মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে বরণ করতে পারব না।" আমার শত প্রতিবাদ যখন আমায় ক্লান্ত করত তখন চোখ মেলে দেখতাম, কমলিকাকে। চিন্তায় যে সত্য সেই আসল। এটা বুঝতাম। রামধনু রং এর শাড়ীতে ওকে বড় মিষ্টি দেখাত। আমি আস্তে আস্তে আয়না-নগরে ঢুকে যেতাম। মন চলত নির্বাসনে। ওকে দেখলেই মন চলত নির্বাসনে। অরণ্যে নয়। মনের গহন গভীরে ছায়াঘন আঁধারে। ঝিঁঝিঁ ডাকের নিঝুম প্রহরে নয়। অপ্রাকৃত অনাদি কালের দুর্বোধ্য গানের সুরেই হয় নির্বাসন। কমলিকা আসে। এ প্রেম নয়। এক নির্বাসন। মন নিয়ে যাই বনে, চালান দি পাহাড়ে, সমুদ্রে কিংবা ছায়াহীন দূর বালুচরে, মনকে বলি মন চলো নির্বাসনে। কমলিকাও যায়। অদ্ভুত আক্রোশে সব কিছু ছিঁড়ি। সব ছেড়ে, সমাজ-সংস্কার, বন্ধু, যতো ভাললাগা ভালবাসা, নিবিড় করে থাকা, আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছার উদ্রেক পাওয়া না পাওয়া, সব কিছু ছিঁড়ে মন চলে নির্বাসনে। এতো প্রেম নয়। শুধুই কমলিকা। কমলিকাকে দেখি। বধির হই। অন্ধ থাকি। অনুভূতিকে রাখি জড়ত্বের কাঁথায়। যা শোনার জন্য কর্ণ শ্রবণোন্মুখ তা শুনি না। যা দেখার জন্য চোখ ব্যাকুল তা দেখি না। কমলিকার স্পর্শে স্পর্শে অনুভূতি রাজ্যের নাম দি অচলনগর। সেখানে সব হাসিকান্নার পাঠ ঢুকানো। কাজ-অকাজের পাঠ বন্ধ। এ প্রেম নয়। শুধু নির্বাসন। সাথে কমলিকা।

অরণির মণিমুক্তো

সিদ্ধার্থ বসু

KIRIBURU—40 km.
BOLANI—48 km.
SARANDAH

(Chaibasa Division)

রাত দুটো। গহন বন। মম্, ঘুমোলেন? হাতের মুঠোয় থরথর করে কাঁপছে নিউট্রাল করা গিয়ার, রেইনট্রর পাতায় তীব্র শিস কেটে, পাহাড়ি ঢাল বেয়ে ছুটছে বনের গন্ধ মেশা ভিজে হাওয়া, জীপটার একটা আলো নেই, চাকা বসে গেছে লাল কাদায়, তবু মম্, মনে হচ্ছে পৌছে যাব, শেষরাতে, কারণ বোলানী আর তিরিশ মাইল, যদিও মাঝরাতের পর বনের পথ বেড়ে যায়, আর সেই সন্ধের পর থেকেই ভারি বর্ষা, অসময়ের বিষণ্ণ মেঘেরা এত নীচে নেমেছে যে একটু হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে, ঝিঁকপানির কাছে চাকা পিছলে গাড়ি টাইগার গ্র্যাসের জঙ্গলে ঢুকে গিয়েছিল, এসব না হলে কখন পৌছে যাই, অথচ মম্ হয়ত আপনি এখন ঘুমোচ্ছেন, গোলাপছাপা বালিসের ঢাকায় অহঙ্কারী মুখ রেখে, অবশ্য আগে দু'বার না জানিয়েই এসেছিলাম, সে বোধহয় গত বছরের কথা, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যদিও চলে আসার পরদিন একটা ছেলেমানুষী চিঠি দিয়েছিলেন,—আঃ……নিরেট পাথরে ধাক্কা মেরেছি,—আবার চাকা পিছলে গেল, সারা বন আজ কাদা হয়ে গেছে নাকি,—কিছু ভাববেন না মম্, জীপ শক্ত গাড়ি, অসময়ে বর্ষার রাতে এমন হয়, শেষরাতেই পৌছে যাব, ভোরের আলোয় আপনাকে ঘুমচোখে দেখতে ইচ্ছে করছে,

CAUTION
HAIR PIN BEND

অথচ কিছুই ঠিক ছিলনা, এদিকে একজন সার্ভেয়ারের খোঁজে এসেছিলাম, বর্ষোয়ায় কিছু মাপজোকের ব্যাপার আছে, জানোয়ারের ভয়ে কেউ যেতে চায়না, —সে যা হয়, চাঁইবাসার লেভেল ক্রসিংটা পেরিয়ে,—মম্ আপনি ভুলে গেছেন

নাকি, গুরুনির পাহাড়ের পায়ের কাছে সেই লেভেল ক্রসিং, যার পাশে নীল রঙের নোটিশ বোর্ডে বৃষ্টির মত ঝিরঝির সাদা অক্ষরে লেখা ছিল—'This Level Crossing will be Open from Sunrise to Sunset……' প্রথম বোলানী এসে পথ হারিয়ে যার পাশে ম্লান আপনি আকাশপাতাল ভাবছিলেন আর, কেন জানিনা, আমার চোখে চোখ পড়তে শিউরে উঠেছিলেন, আপনার বুক ছাড়িয়ে কবিতার মত নিখুঁত বন নেমে গেছে সূর্যাস্তের দিকে, সে এক আধো অচেনা প্রায় চেনা অনুভূতি, আমি জানি মম্ সেইদিন, সেই শেষ শরতের বিকেলে আপনি এই মূল্যবান পাথরের দিকে রমণীর উদ্ধত হাত বাড়িয়েছিলেন।

DRIVE SLOW

কোনো কোনো ঔদ্ধত্বের কিছু উত্তর দেয়া যায়না মম্ আপনিই বলুন, শুধু নিষ্ঠুর নিবিড়তায় হৃদয়ের লেভেল ক্রসিং খুলে দেয়া ছাড়া, তাই আজও, এই শরতের শেষ বিকেলে আপনার নিঃঝুম চোখদুটি দেখতে ইচ্ছে হল, চাঁইবাসার লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গাড়ি ঘোরালাম বোলানীর দিকে, সেই থেকেই আকাশ ভেঙেছে, শাল-মহুয়ার ভেজা সুবাস ছুঁয়ে—আরে! বাইসন বেরিয়েছে! বোধহয় কোনো রাতের ঝর্ণায় জল খেতে চলেছে, ডজনখানেক ত' হবেই, বাঃ—কেমন রাগী রক্তিম চোখ! শিঙের আগা থেকে লেজ পর্য্যন্ত কেমন বলিষ্ঠ আরণ্যক সরলরেখা! ভাবনা নেই মম্, ওরা অন্ধকারের জীব তবু আলোর জগতের সঙ্গে শত্রুতা করেনা, ভাববেন না আমার 475টা বহুদিন ক্যাম্পথাটের তলায় পড়ে আছে বলে এসব বলছি, অবশ্য ঠেস দিয়ে কথা বলা আপনার বরাবরের স্বভাব, কি সুখ পান আপনিই জানেন, বোধহয় নান্দনিক তৃপ্তিমাত্রেই একটা অ্যান্টিপ্যাথি কাজ করে, গোলাপের যেমন কাঁটা তেমন সুবাস, যাকগে দার্শনিক না হওয়াই ভাল মনে হয়, বিশেষত এত রাতে, এমনিতেই আপনি বলেন আমার চরিত্রে একটা নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতা আছে, এখন এসব বললে কাল সকালে হয়ত চায়ে চিনি দেবেন না, সে বড় বাজে ব্যাপার হবে, তাছাড়া বিনা কারণে একাধিকবার আপনাকে সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেলতে দেখেছি সুতরাং ঝুঁকি নেয়া যায়না, মম্ ঘুমোলেন নাকি, গাড়ি বড় লাফাচ্ছে, বহুক্ষণ স্পীড দিতে পারছি না, অথচ শিরায় শিরায় ইচ্ছে করছে ঝড়ের আগে ছুটে গিয়ে আপনার ঘরের আলো জেলে বিব্রত করে দিতে, কারণ সেবার ঝিঁকপানির পাহাড়ে, দিনশেষের আলোয়, আপনার পায়ে ফোটা বাবলাকাঁটা যখন তুলে দিয়েছিলাম, তখন মেঘনা চোখ

মেলে বলেছিলেন কোয়ার্টারের বারান্দায় রোজ সন্ধেয় বনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অথচ আমি আসিনা, বলেছিলেন স্বপ্নের মত উষ্ণতায় আপনাকে ঘিরে রাখতে, অন্তত ঘিরে রাখতে।

SLIPPERY ROAD

সেই থেকে আমি জানি আপনি ভাল নেই মম্, রক্তের প্রতিটি ফোঁটায় আপনি রাতপাখির চেয়েও একা, একটা ভুলের গারদে আপনার বিশ বছরের সূর্যমুখী জীবন জলে যাচ্ছে, সংসার আপনার তাসের ঘর, ঘষা পয়সার মত অব্যর্থভাবে ব্যর্থ, অথচ মম্ জীবনের বদলে আপনি চেয়েছিলেন কোনো মরমীকে, কতদিন পথ চেয়ে আছেন, সে আসেনা, তবুও কান পেতে থাকেন, কুটো পড়ার শব্দটিও নেই, তবুও, কেউ আসেনা, কেউ আসেনা, শক্ত দুটি হাত বাড়িয়ে দেয়না, বুক ভরে থাকেনা,।

DEAD SLOW
NARROW BRIDGE AHEAD

ভুলে যান মম্, স্বপ্ন কোনোদিন নিষ্ঠুর হয়না, দিন কারো সোনার খাঁচায় থাকেনা, বহুদিন দেখা নেই আপনার সঙ্গে, উড়ো খবর পাই এর ওর কাছে, বুঝতে পারি প্রাণপণে সুখে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করছেন, অস্থির পিপাসা নিয়ে মানবিক অনুভূতিরা ঢুকে যাচ্ছে রক্তের ভেতর,.....কি সর্বনাশ! ছোট্ট ব্রীজ ভাসিয়ে বুনো নদীর ঢল নেমেছে, হেডলাইটের আলোয় যতদূর চোখ যায় ঘোলাজল ছল ছল করে ছুটছে, পাহাড়ি ঝোরা ছাপিয়ে গেছে কোথাও, অন্ধকার বনে শুধু ঝরঝর নিঃশব্দ, হাঃ হাঃ, আমি হৌচট খেতে জানিনা মম্, তাছাড়া জীপ শক্ত গাড়ি, মাঝখানের ভাঙাটা পাশ কাটিয়ে যাবই, জলের তোড় কি ব্যসরে, মম্ আপনার মনে আছে কবে যেন আমরা রাজরাপ্পা গিয়েছিলাম, শীতের শেষে, চিতরপুটের কাছে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল, আপনি রাগ করে পাশের ঝর্ণার শাড়িটাড়ি ভিজিয়ে ডেকে বললেন "কেমন লাগছে আমাকে?" সে ছিল ভারি সূর্যমুখী দিন, ধূসর রুক্ষতা পেরিয়ে সেই স্নিগ্ধসবুজ মাঠ, দিগন্তের কুয়াশাঘেরা নীল পাহাড় সব আমি ছুঁয়ে দেখেছিলাম, আর ফেরার পথে, যখন অরণ্যের ছায়া স্মৃতির চেয়ে দীর্ঘ হয়ে গেছে, তখন বলেছিলেন এমন কত ছিন্ন স্বপ্নের কাছাকাছি কান পেতে থাকেন, সদরের পাশে বিষণ্ণ লেটারবক্স থমকে চেয়ে থাকে, শুধু দিনশেষের

সুগন্ধি রোদে নির্জন হয়ে থাকেনা অভিমানী ছোট্ট নীল চিঠি, হাঃ হাঃ আপনি ভারি ভাল মম্, বড় নরম, আমি এসে গেছি, জামদার মোড় পেরিয়ে এবার কিশোরীর বিনুনির মত পিচরাস্তা, বৃষ্টি থেমে গেছে, অসময়ে বর্ষার রাত আরো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চাঁদ ভাসতে ভাসতে কিরিবুরুর চূড়োয় আটকে গেছে, রাতের প্রজাপতি ফুরফুর ডানা দুলিয়ে ভেসে যাচ্ছে হেডলাইটের আলোয়, শেষরাতের ভারি, ভেজা সুবাস মিশে যাচ্ছে অস্তিত্বের প্রতিটি অণুকণায়, এখন শুধু ছুটে যাওয়া, কোয়েলের তীর ধরে, সুবর্ণরেখার বাঁকে, নির্জন পাহাড়চুড়োয়, সবুজ ক্ষেতের আল বেয়ে, প্রায় স্বপ্নের মত বসে থাকা, পা ডোবা ঝোরার স্রোতে, শরীর হারিয়ে অশরীরী উচ্ছল উৎসব।

এত অন্ধকার। অথচ সদরের আলোটা ত' সারারাতই হিমে ভিজত, কাগজফুল গাছটার পাশে? আমার জীপের হর্ণ আপনার চেনা মম্। সাড়া দেবেন না? ঠিক আছে, সকালে আধঘণ্টা কথা বলবেন না, শর্ত। মম্, পলাশবনে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে, আলো জেলে দিন। দুঃখিত বাতাস বয়ে থেমে গেছে, ভেজা ভেজা আদিগন্ত অন্ধকার মাঠ, কাউকে চিনিনা, মম্ বারান্দায় এসে দাঁড়াবেন না? —এ, কোই হ্যায়? সব ব্যাটা পচাই গিলে পড়ে আছে যা মনে হয়। কে রে তুই?—ও, দুখনের ছেলে সুখন? বেশ বেশ। সাব চক্রধরপুর গেছে? কোন দুঃখে। না না, গাড়ি এখানেই থাক। আর মেমসাব গেছে কলকাতা? না রে, ঘর খুলতে হবেনা তোকে। চাও বানাতে হবেনা। বাগানটা দেখে যাই—আলোটা কই রে।—এত বড় বড় ঘাস, মালী নেই? কোণের এই গোলাপটায় রোজ জল দিবি, জামদার হাট থেকে মম্ গতবার কিনেছিল। এত গাঁদা লাগাল কে? জানলার পাশে ম্যাগনোলিয়া গাছটা ঠিক তেমনই আছে—বাঃ। গোড়ায় ওটা কি—সুখন আলোটা ধর ত'—কি ওটা সাদামত? একটা কার্ড? একসারি বক? ও। সুখন কটা বাজে রে? তাই নাকি, তাহলে দেরী হয়ে গেছে, এখনই যেতে হবে। না, কিছু বলে দিতে হবে না। কি বলছিস? মেমসাব মামলা ঠুকতে গেছে? আবার বিয়ে—তোর ব্যাটা এত খবরে দরকার কি—যা ভাগ্। এই এক প্যাকেট সিগারেট রেখে দে।

স্পীডমিটারের কাঁটা নব্বইতে আটকে আছে, ঘাট মাইলে এক ঘণ্টা, অনেকদিনের না ছোঁয়া সুখের স্পর্শ পাচ্ছি, একটা নির্মল দুঃখ, যন্ত্রণার রেশও নেই বুকে, মম্ এই কার্ডটা গতবছরের জন্মদিনে পাঠিয়েছিলাম নাকি, হ্যাঁ এইটাই,

এইযে দেখুন আমার লেখা,—'ভোরের শিশিরের মত আরো কিছু অশ্রুময় সময় ঝরে যাক', তার নীচে এসব ত' আপনার লেখা, কি তাই না,—কয়লা বারো টাকা, কাল সকালে কেরোসিন বাইশ টাকা, পরে ফেরত আট টাকা হাঃ হাঃ, তার নীচে আমার সই,—অরণি, ১৪/৯, হিজিবিজি কেটেছেন কেন, তা বেশ করেছেন, জ্যোৎস্নার চাপে বুকের সূক্ষ্ম হাড় ভেঙে গেছে, তা যাক, এখন শরৎ, আবার শরৎ, আকাশ এত অনাবিল নীল, স্বচ্ছ, ভালবেসে পৃথিবী ত' বলেইছিল আশ্বিনের মাঠের পথ বেয়ে ঘরে এসো, তুমি ঘরে এসো, আমার দৃপ্ততা তাই ক্রমশ সমুদ্র হয়ে গেছে, কপাল থেকে কবে অনামিকা দিয়ে দুরন্ত চুল সরিয়েছিলেন সে আজ যুগান্তের কথা। মম, মমতা, এই মমতাময় পৃথিবীতে সরীসৃপের জগৎ ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, রক্তে রাতের ভেজা শালবনের সুবাসে, খর নদীর কিনারে এখনও ব্যথালীন আপনার আধখানা পরিচয়, এখনো বিকেল, জামদা ফেরার শেষ ট্রেন চলে গেছে, ভালবাসা নয় সেই সৌন্দর্য্য, চিরকাল দণ্ডিতের মত যার শোভা দেখে যেতে হবে, মম, মমতা, আপনি কি লেভেল ক্রসিং এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, পড়ন্ত রোদে আপনার মুখ ম্লান হয়ে আছে, প্রথম ভালবাসলে ঠিক যেমনটি হয়।

CAUTION
HAIR PIN BEND

জনকল্যাণে স্ট্যাটিস্টিক্স্

শর্মিলা ব্যানার্জী

'**স্ট্যা**টিসটিক্স' কথাটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'State' শব্দটির সংগে জড়িত। কিছুকাল আগেও এর অর্থ বলতে আমরা বুঝতাম কিছু সংখ্যাসূচক তথ্য যার ওপর নির্ভর ক'রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এর অর্থকে একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়ে নিয়ে বলেছেন সংখ্যাতত্ত্ব বা রাশিবিদ্যা হল সেই বিজ্ঞান যা আমাদের সাহায্য করে যে কোন ঘটনা বা সত্যের বিশ্লেষণে এবং তার ব্যাখ্যায়। কোন ঘটনার ফল বা কিছুর গুণগত মানকে আমরা ক্রমশঃই সংখ্যায় পরিমাপ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। এটা সুলক্ষণ কারণ এতে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেকটা যথাযথ হয়। সেই সমস্ত সংখ্যাসূচক পরিমাপ বা 'Observations' এর সাহায্যে যদি আমরা পুরো ঘটনার বা সত্যের ব্যাখ্যা করতে চাই এবং ভবিষ্যৎএর অনুরূপ ঘটনার সম্পর্কে সুদৃঢ় ধারণা করতে চাই এবং আরও উন্নত ফললাভের জন্য কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি তবে সেক্ষেত্রে আমাদের পথদ্রষ্টা সংখ্যাতত্ত্ব।

হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে নাকি, সব ভাত থেকে একটি-দুটি ভাত তুলে টিপে দেখে সব ভাতের সিদ্ধ হবার অনুমান করা যায়। এতে সংখ্যা বিজ্ঞানের একটি মূল সত্য ধরা পড়ছে। অর্থাৎ নমুনা থেকে সামগ্রিকের ধারণা। সংখ্যা যদি খুব বড় হয়, তবে দেখা যায়, তার মধ্যে কোনো কোনো গুণের পরিবর্তনে বড়ো গড়িমসি আছে। একে বলে বৃহৎ সংখ্যার জাড্যতা। এটি সংখ্যা বিজ্ঞানের ভিত্তি। আর এই জাড্যতার গুণ হলো বড়ো সংখ্যার গুণাগুণগুলির গড় সংখ্যার দিকে থাকে প্রবণতা। এই প্রবণতাকে ব্যবহার করে বৃহৎ সংখ্যার গুণাগুণ নিয়ে স্বাভাবিক সম্ভাব্যতার (Normal Distribution) বিস্তার রেখা পাওয়া যায়। এই সম্ভাব্যতার নিরিখে বহুকিছু যা হওয়া উচিত, সেই ঔচিত্যের সাধারণীকরণ সম্ভব। এই সাধারণীকরণই স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিত্তি।

একজন রাশিবিজ্ঞানীর মূলকাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ কোন ঘটনার বা কোন বিষয়ের ওপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তার বিশ্লেষণ করা এবং সেটি কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা সম্ভাবনার নিয়ম মেনে চলছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা, দ্বিতীয়তঃ সেই নিয়মটির যথার্থতা সম্পর্কে পরীক্ষা করা।

যথার্থ প্রমাণিত হলে সেটির ব্যবহার অন্যথায় পরিবর্তন। এই মূল কর্মপন্থাকে আশ্রয় করেই সংখ্যাতত্ত্ব তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখাকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে। আধুনিক কর্মব্যস্ততার যুগে, জনবৃদ্ধির যুগে, সভ্যতার ক্রমোন্নতির সোপানে পদক্ষেপের যুগে সংখ্যাতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। তার গাণিতিক কর্মকাণ্ডের বিশাল যজ্ঞভার বিজ্ঞানীদের হাতেই থাকে। এখানে সাধারণের কাছে সমাজকল্যাণে তার ভূমিকার দু একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

কৃষিক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন ধরণের গুণাবলী সমন্বিত জমির কোন্‌টিতে কোন্ ফসলের বা একটি ফসলের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের কোনটির প্রয়োগ সবচেয়ে লাভজনক হবে তার উত্তর পাওয়া যায় সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে। বীজবপন বা কৃষিকাজের পূর্বেই যদি আমরা মোট কৃষিযোগ্য, জমির ও বীজের মান সম্বন্ধীয় তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা পোষণ করতে পারি তবে তা যে কোন দেশের কৃষি পরিকল্পনায় বিরাট সাহায্য করবে।

আসা যাক্ শিল্পের কথায়—কোন একটি সংস্থা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন করে। প্রতিটি দ্রব্য উৎপাদনে নির্দিষ্ট খরচ আছে। উৎপাদনের পরে দ্রব্যগুলি বাজারে আসে ও নির্দিষ্ট দামে বিক্রীত হয়। এবং এর ফলে সংস্থাটির কিছু লাভ হয়। এখন উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং অর্থের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও কোন দ্রব্যের কত পরিমাণ উৎপাদন সর্বাপেক্ষা লাভজনক—এটাই যে কোন শিল্পসংস্থার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এছাড়াও যে কোন শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রেই উৎপন্ন দ্রব্যের স্থায়িত্ব বা আয়ু অর্থাৎ তার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মোট উৎপন্ন দ্রব্যে 'defective' এর পরিমাণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। সব কটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে সংখ্যাতত্ত্ব।

দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণের, জনসংখ্যা পরিবর্তনের হার ও প্রবণতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হ'ল সংখ্যাতত্ত্ব। এ ছাড়াও সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে জন্ম-মৃত্যুর হার, বিভিন্ন বয়সে মৃত্যুর হার প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব, যা কোন দেশের নতুন কর্মসূচি নেবার পক্ষে একান্তই অপরিহার্য।

জেনেটিক্সের ক্ষেত্রেও সংখ্যাতত্ত্বের অবদান অসামান্য। কোন একটি জেনারেশনের গুণাবলীর বা বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি ক'রে সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে পরের জেনারেশনের কত অংশে সেই গুণাবলীর সবকটি বা

কয়েকটি থাকবে। কৃষিক্ষেত্রে একটি শস্যের দুটি প্রকার পরনিষেক-এর সাহায্যে কোন উন্নত মানের শস্য পেতে হলে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন এই প্রথায় উৎপন্ন শস্যের কতটা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মানের হবে। আমাদের এই ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করে সংখ্যাতত্ত্ব।

পদার্থবিদ্যাকেও নানাভাবে সাহায্য করছে সংখ্যাতত্ত্ব। বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলের একটা তুলনামূলক গবেষণা করে সেই তত্ত্বর নির্ভর-যোগ্যতার পরিমাপ করছে সংখ্যাতত্ত্ব। এ ছাড়াও ফোটন কণিকার গতিপ্রকৃতি যাচাই Real Gas-এর আপেক্ষিক তাপতত্ত্বের কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা প্রভৃতির পেছনে সংখ্যাতত্ত্বের দান অনেক।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বহু কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান এনে দেয় সংখ্যাতত্ত্ব। কতকগুলি দ্রব্য কয়েকটি উৎপত্তিস্থল থেকে কয়েকটি গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। প্রতি উৎপত্তিস্থলেই উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ সীমিত ও প্রতি গন্তব্যস্থলে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যের দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে পরিবহণের খরচ বিভিন্ন। এক্ষেত্রে সমস্ত শর্তপূরণ করে এমন একটি পরিবহণ পদ্ধতির প্রয়োজন যার ফলে পরিবহণের খরচ সর্বাপেক্ষা কম হয়। আবার আর একটি সমস্যার কথা ধরা যাক্। বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন লোক দিয়ে কয়েকটি কাজ সম্পন্ন করাতে হবে। এখন কাকে কোন কাজে নিযুক্ত করলে সবচেয়ে কম সময়ে বেশী কাজ পাওয়া যায় তার একটা ধারণা থাকা দরকার। সব কটি প্রশ্নের সমাধানেই সংখ্যাতত্ত্ব। ট্রাফিক জাম-এর ক্ষেত্রেও গাড়ী আসার হার ও বিশেষ কোন চৌমাথায় পেরোতে যা সময় লাগে তার ওপর ভিত্তি করে এমন সিগ্‌ন্যালিং (সময় ভিত্তিতে) এর প্রয়োজন যা গাড়ীর 'কিউ'-এর দৈর্ঘ্যকে কমাতে সাহায্য করবে। এরূপ আরো অনেক ক্ষেত্রেই 'কিউ-এর দৈর্ঘ্য কমাবার চেষ্টা বা প্রয়োজন হতে পারে। এই সমস্যার সমাধান সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা সহজেই সম্ভব। এছাড়াও নদী-পরিকল্পনা, নৃতত্ত্ব বিদ্যায়, আবহগবেষণায়, ভূবিদ্যায়, সংখ্যাতত্ত্বর বহুল ব্যবহার আছে।

কোন দেশের অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে অর্থনীতির ওপর। এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিমাপের ক্ষেত্রে সংখ্যাতত্ত্ব অপরিহার্য।

সময়ের সংগে সংখ্যাতত্ত্বের ব্যবহার ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এখানে তার একটি ক্ষুদ্র অংশের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হল মাত্র। পরিশেষে আধুনিক ভারতে সংখ্যাবিজ্ঞান-এর অন্যতম কর্ণধার ডক্টর সি.আর. রাও-এর ভাষায় বলা যায়,"The scope of statistics seems to be unlimited so long as the quest for new knowledge continues, to understand nature and to improve the efficiency of human efforts.

বাংলাদেশের নাটক

সর্বেন বন্দোপাধ্যায়

বাংলাদেশের তরুণ নাট্যকর্মী কামালউদ্দিন দেশে ফেরার আগে কলকাতায় ছিলেন কদিন। আলাপ হতে তিনি বাংলাদেশের শুধু নাটক নয় নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান খবর জানালেন। আধুনিক থিয়েটার সম্পর্কে বললেন যে ৭১ সালের পরেই তার শুরু। আগে ছিল পার্শী থিয়েটার। এখনও অবশ্য মূলতঃ নিজেদের নাটক বিশেষ নেই। বিদেশী নাট্যকারদের থেকে নিয়েই নাটক এগোচ্ছে ধীর পায়ে। অবশ্য ৭২ সালের পরে ইউনিভার্সিটির কয়েকজন পরীক্ষামূলক ভাবে নাটক রচনা ও অভিনয় প্রচেষ্টা চালান, তা প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়। জিজ্ঞাসা করলাম, নাটককে পেশা হিসাবে নিলেন কেন?' 'ভাল লাগে' জবাব দিলেন কামাল 'আমার মনে হয় নাটকই এখন একমাত্র মাধ্যম যা আমার দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গরীব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শোনাতে পারে, যা এদের সংস্কৃতি সচেতন করে তুলতে পারে।' বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাংলা নাটকের বিশেষ কোন স্থান নেই, বললেন তিনি। '৭৫ এর পর ভারতে যে সব ছাত্ররা এসেছিলেন তাঁরা আধুনিক বাংলা নাটক গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিলেন। সৈয়দ সামসুল হক বলতে গেলে একমাত্র সফল নাট্যকার। উঠতি নাট্যকারদের মধ্যে সেলিম আলদিন সম্ভাবনাময়। বর্তমানে কলকাতার বাংলা নাটকের সঙ্গে ওঁদের চলতি নাটকের সাদৃশ্য প্রচুর। সপ্রতিভ ভাবে বললেন কামাল 'সত্যি কথা এটাই যে বাংলাদেশের নাটক ভীষণ ভাবে কলকাতা নির্ভর।'

প্রসঙ্গত, শহীদ মুনীর চৌধুরীর গণমুখীন নাটক 'কবর'-এর কথা আমরা জানি। এমন কি ঢাকায় সম্প্রতি 'রক্তকরবী', 'আন্তিগোনে' অভিনীত হয়েছে। 'উদীচী' গোষ্ঠীও নানা পরীক্ষা করেছেন।

'আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?' প্রশ্ন করলাম; হাসলেন কামাল, বললেন 'নাটক করব।' দেশের শতকরা পঁচাশি জনঅশিক্ষিত লোকের কাছে গ্রামবাংলার লোক সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন বিষয় তুলে এনে, লোক গাথা'র সাহায্য নিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে পৌঁছে যাবার জন্য কাজ করবেন কামালরা। শহর ঘেঁষা ব্যর্থ নাটকগুলিকে বাতিল করে নতুনের পথে এগোনোই ওঁর লক্ষ্য। ওঁর কথাতেই 'অশিক্ষিত অভুক্ত মানুষকে সংস্কৃতি সচেতন করা বা তার রুচি পাল্টানো তো একদিনের কাজ নয়'।

চলচ্চিত্র সংবাদ

পারী কমিউনের দিনগুলি ফুটে উঠেছিল গুস্তফ কুর্বের ছবিতে, নক্সায়। এক সময় সের্গেই আইজেনস্টাইন মেকসিকোর ওপর ছবি করবেন বলে, বিস্তৃত স্কেচ করেছিলেন ইউকাতানে। সোভিয়েত তথ্যচিত্র নির্মাতা আলদোকিন। তিনি গুস্তক কুর্বের উপরে প্রামাণ্য জীবনী চিত্র তুলেছেন। কুর্বের ছবিগুলি, তাঁর এচিং,তাঁর কার্টুন এ তথ্যচিত্রে চমৎকারভাবে অন্তর্গত হয়েছে। আলদোকিন এখন প্যারীতে। ঐ ছবিটির প্রদর্শনীতে তিনি বলেছেন, 'জওহরলাল নেহরু'র উপরে একটি প্রামাণ্য জীবনীচিত্র তুলবেন। ভারতীয় ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ফিল্ম সংস্থাগুলির পারস্পরিক সহযোগিতায় এটি নির্মিত হবে। স্টকহোম সিনে মহাফেজখানায় যে সব ডকুমেণ্টারি ও অন্যান্য তথ্য রয়েছে, সেগুলি পাবার ও কাজে লাগাবার কথা ভাবছেন।

তবে ছবিটির মহরৎ হয়ে গেছে। প্রাথমিক পর্যায়ও শেষ হবার পথে। ঐতিহাসিক ও চিত্রনাট্য লিখিয়েদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি-সম্পন্ন ভি. জিমসানিন। ছবিটির বিষয় সেই ভারতের স্বাধীনতা সাধনার ঝোড়ো দিনগুলি। গান্ধীজীর সঙ্গে এই ছবিতে জওহরলাল নেহরুকে বহুবার দেখা যাবে। ব্যক্তিত্ব, প্রাজ্ঞতা, বিপুল কর্মকাণ্ডের নেতা জওহরলাল নেহরুকে উপস্থাপনা করা হয়েছে জাতীয় বিকাশের স্তর পরম্পরায়। পরশ্রমগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতার পাথর চাপা ভারতকে তো বটেই, ইতিহাস পরিক্রমায় তাঁর সাধনায় বিশ্বে গরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন ছিল জীবনের মহালক্ষ্য।

অপারেশন সেনটরস

চিলিতে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয় ১৯৭৩ সালে। সালভেদর আলেন্দের নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করে সি আই এ ও চিলির প্রতিক্রিয়াশীলপুষ্ট সামরিক বাহিনী। এই চক্রান্তকে সামরিক চমু গোপন নাম দিয়েছিল অপারেশন সেনটরস। সেই নামেই এই ছবিটি কলকাতায় এসেছে। চিলিতে ফ্যাসিস্তদের ক্ষমতা দখলের আগে মিথ্যা ও জাল-জুয়াচুরির কর্মকাণ্ড, সংবাদ-পত্রকে দিয়ে তাদের একচেটিয়া মালিকদের কাজ, বিশ্বস্ত ও দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও ঘৃণ্য চরিত্রহননের আক্রমণ—সব নিয়ে ছবিটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

তবে চিলির কথা প্রকাশ্যভাবে কোথাও বলা হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রজাতন্ত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে পৃথিবীর যে কোনো বিকাশমান দেশে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। এতে রয়েছে যেমন অমিতবীর্য সাধারণ মানুষ, তাদের রাষ্ট্রপ্রধান, শহীদানে তৈরি দেশপ্রেমিকেরা। উল্টো দিকে রয়েছে কালো পরকলা চোখে নরঘাতকদের ঘৃণ্য প্রতিনিধি। আপাত পরাজয় মানুষের ঘটে বটে। তবু শোনা যায়, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।

এমন ছবি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আর একটি আগে এসেছিল। প্যাট্রিস লুমুম্বার ঐ বিপ্লব সাধনাকে ভিত্তি করে 'দি ব্ল্যাক সান'।

এক সময় এদেশে মেকসিকোর বিপ্লব সাধনার ছবি ভিভা জাপাটা, ভিভা ভিল্লা, পলমুনি অভিনীত উয়ারেজ খুব জনপ্রিয় ছিল। ব্ল্যাক সান ও অপারেসন সেনটরস আরো বেশি জনপ্রিয় হোক তরুণ তরুণীদের কাছে।

মহাশ্বেতা সান্যাল

পুস্তক পরিচয়

প্যারী কমিউন / অমলেন্দু সেনগুপ্ত / মনীষা / পনেরো টাকা

আলবের্ত সোয়ায়েতজার উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে, খুঁজে পেয়েছিলেন ঐ শতকের শক্তিমত্ততার প্রকাশ। একদিকে নাকি ছিল পুঁজির মালিকদের ক্ষমতাপ্রীতি এবং তা রক্ষার জন্য শক্তি প্রয়াস, অন্যদিকে শ্রমিকদেরও। সেই শক্তিমত্তার প্রতীক নাকি নীৎসে ও মার্কস।

ইতিহাসও তেমনি নির্মম ও পরিহাসমুখর। নীৎসের নব্বই বছরের বোন নীৎসের হাতের ছড়িটি উপহার দিয়েছিলেন হিটলারকে। ডিমিট্রভের ভাষায় যে হিটলার ছিলেন জাত্যন্ধ একচেটিয়া পুঁজির সবচেয়ে আক্রমণাত্মক সন্ত্রাসমূলক শক্তির প্রতীক। আবার নীৎসেই বলেছিলেন, নান্দনিক শিল্প-আভিজাত্যের মধ্যে রয়েছে মানুষের ইতিহাসের বিকাশ, বাকি সাধারণ মানুষদের পশুপাল ছাড়া ভাবা যায় না। তাদের উপরে 'অতিমানব' লাঠি ঘোরাবে, তাড়না করবে;—এই নাকি সভ্যতার মূল সারাৎসার।

কিন্তু মার্কস কি এই শক্তির কথা বলেছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন, মানুষের সর্বব্যাপ্ত উন্মোচন। প্রকৃতির জীব মানুষ, অথচ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম বোধ। শ্রম যার অন্তঃসার, সেই মানুষ প্রকৃতি থেকে মুক্ত হতে গিয়ে, শ্রমোৎপাদিকায় ভোগের উপরে উদ্বৃত্ত বানাবার সামর্থে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির দাক্ষিণ্যে হয়ে পড়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বন্দী। সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া তার শ্রেণী সংগ্রাম। পুঁজিবাদী সমাজে যে শ্রমিক, তাকে মানবিক অন্তঃসার আবিষ্কার করবার জন্য—প্রকৃতি ও মানুষ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও ব্যক্তিমানুষ এবং মানবিক অন্তঃসার ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্জিত সামাজিক সত্তা—এদের মধ্যকার বিযুক্তি উত্তীর্ণ হতে হয়। এজন্য তার নিজের সমাজও বানাতে হয়, নিজের রাষ্ট্রও। তারপর অপর শ্রেণীর উপরে বল প্রয়োগের যন্ত্র রাষ্ট্রও একসময় শ্রেণীহীন সমাজে শুকিয়ে যায়। তাই সোয়ায়েৎসারের মূল্যায়ণ মতো এক পর্যায়ে মার্কস ও নীৎসেকে শক্তি বিষয়ে চিন্তা করার জন্য, একাসনে বসানো যায় না।

প্রমাণ? আজ থেকে একশো দশ বছর আগে প্যারীতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিষ্ঠিত 'প্যারী কমিউন'!

শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রথম প্রতীক। যে-রাষ্ট্র বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছিল, মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছিল মানুষের মর্যাদা, অস্ত্রধর হয়ে দুঃখী মানুষ সমস্ত দুঃখের শিকড়, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য দেশ ও দেশবাসী বিকিয়ে দেওয়া শোষকদের ধর্ম। ব্যক্তিমালিকানার চমু বিশ্বের প্রতিক্রিয়াশীলদের এক করে, দেশকেও প্রশ্নীয়দের কাছে বাঁধা দিয়ে নিজ দেশের শ্রমিক শ্রেণীর উপরে নৃশংস আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মৃত্যুতে মৃত্যুতে ছেয়ে গেল প্যারী। তবু মৃত্যুঞ্জয় মানুষের শহীদান পৃথিবীময় জাগিয়ে গেল শোষণহীন সমাজের আদর্শ।

অনেকেই খবর রাখেন না, ঐ জনবিরোধী লুই নেপোলিয়নের দাপট, তথাকথিত ঐতিহাসিক থায়ার্স-এর জঘন্য চক্রান্ত—এ-সব কিছুর বিপক্ষে যেমন জন-দরদী চিত্র আঁকছিলেন গুস্তক কুর্বে, আবার সেই সামাজিক সংঘাতে সেই নোংরা জঘন্য তৈজস আঁকড়ে রাখার বিকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যতর সৌন্দর্য চাইছিলেন বোদলেয়র, প্রকৃতির তাৎক্ষণিক সৌন্দর্যের অন্বেষণে অতি সাধারণ মানুষের ছবি আঁকবার প্রেরণা পাচ্ছিলেন ইমপ্রেসনিস্টরা। প্রতিক্রিয়ার

বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ালো অন্যতর শিল্প। যা নীৎসের শিল্প আভিজাত্য নয়। মানুষের জন্য। যা হিটলারি ব্যবস্থা নয়, সমাজতন্ত্র।

এ সবকিছুর ইতিহাসের মূল বীজটি বুঝতে গেলে অমলেন্দু সেনগুপ্তের 'প্যারী কমিউন'পড়া তরুণ তরুণীদের, বিশেষভাবে তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের অবশ্য কর্তব্য। নান্দনিক শিল্প নিয়ে কোনো পরিচ্ছেদ তিনি লেখেননি অবশ্য। কিন্তু আধুনিক শিল্প সাহিত্যের শিকড় কোন সংঘাতের সময়ে মানুষের দিকে ছড়িয়ে গেছে, কখনো অভিমানে কখনো বিপ্লব মনস্কতায়—তার ইঙ্গিত আছে বইটিতে। আমাদের ভাষায় এমন একটি অনবদ্য গ্রন্থ রচনার জন্য লেখক তরুণ তরুণীদের ধন্যবাদার্হ। বিপ্লব কেবল একটি শব্দ নয়। তার অন্তরতম সত্তার মধ্যে রয়েছে মানুষের মুক্তির বীজ, মানুষের স্বরক্ষেপণ। সমাজতন্ত্রের বর্ণপরিচয় ঘটে সেই প্রথম সাধনার ইতিহাস জানার মধ্যেও।

বিশ্বরূপ সান্যাল

সম্পাদকীয়র বদলে

মহেঞ্জদাড়ো নয়

ব্যক্তিগত অবস্থান নিয়ে মানুষ তার দুঃখের দিনে যতনা দার্শনিকভাবে চিন্তিত, তার চেয়ে ঢের বেশি চিন্তা জ্বরে জর্জরিত যখন ঐহিক সুখে সে গড়াচ্ছে। বিশেষতঃ যখন তার ঐহিক সুখের ভিত্তিতে রয়েছে অনিশ্চয়তা। যেমন, শোনা যায় গ্রীসদেশ আক্রমণ করতে এসে পারসিক সম্রাট জারেক্সেস সমুদ্রে ভাসমান হাজার হাজার তাঁর রণতরী, বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁর নানা দেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। 'হায় এরা সবাই মৃত্যুর শিকার—এক সময় সবাইকেই মরতে হবে'। আবার ঐ পারসিক বাহিনীকে পরাস্ত করার পর, এথেন্সের প্রাচুর্যের যুগে প্রশ্ন উঠেছে, এ স্বস্তি কি চিরায়ত। এর পর কি পতনের দ্রুত তামসযাত্রা? চূড়ার দিকে উঠতে উঠতে পতনের এই যে সহজাত বোধ যাকে বহু পরে তরুণ কবি জন কীটস বলেছিলেন নেতিমূলক সামর্থ বা নেগেটিভ কেপেবিলিটি—যা জন্ম দেয় সেই প্রশ্নের—এবার পতন আসন্ন,

পতনের পরে কি, ব্যক্তিমানুষের এত-যে অর্জন এর পর নিয়তি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? সেই দাসপ্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত সমাজে শিল্পী প্রশ্ন তোলেন, যে মালিক তার কি দাস হবার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়? যে স্বজনের জন্য লড়াই করে, পরাস্ত হয়ে দাস হয়ে যায়, তার লড়াইকে কি মনুষ্যত্বের বিচার মহিমা দেবে না? তখন আসে প্রমিথিউস-এর প্রতীক এসকিলাসের কাছে,ব্যক্তি বিজয়ের মধ্যে পতনকে দেখিয়ে দেন ওয়াদিপাউসের মধ্যে সোফোক্লেস,প্রভুসমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ নেয় আন্তিগোনে, পুরুষ প্রধান সমাজে বন্দিনী ইউরিপিদিসের মিডিয়া। মানুষ যেন অভিশপ্ত হয়ে বার বার অভিশাপ মুক্তির দায় নিয়ে কাঁধে বয়ে চলেছে সিসিফাসের পাথর পাহাড় চূড়ায়, জলপান করতে গিয়ে বারবারই জল ঠোঁটের কাছ থেকে দূরে সরে যায় ট্যান্টালাসের। সোনার আকাঙ্ক্ষায় অতি আগ্রহী মিদাস তার স্বর্ণময় ভুবনে স্নেহাস্পদা কন্যাকে করে দেয় সুবর্ণময়ী শব তার স্পর্শে। তার পানভোজনের জগৎ স্বর্ণময় হয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গুপ্তধনের ঝকমকানিকে এক ফোঁটা আকাশের জন্য হাহাকার করে। নার্সিসাস আপন রূপে মুগ্ধ হয়ে, প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনীর পাড়ে আপনরূপে তদগত থেকে, নিজের বহিরঙ্গ দেখে আত্মাহীন ব্যক্তিত্বে একসময় হয়ে যায় অতি তুচ্ছ গুল্ম। এমনি সব প্রতীকে রয়ে গেছে অতীতের শিক্ষা। কিন্তু মানুষ কি সে শিক্ষা নিয়েছে?

আমরা শুধু ভাবছি বর্তমান বিশ্বে কত বড় বড় বিপ্লব এনেছি আমরা। কত প্রগতি! পরমাণুর বিদারণ, ইলেকট্রনিকস, মহাকাশ অভিযান, প্রাণীবিজ্ঞানে বংশধারার জীবনসংকেত—কতো কি। পরমাণু বিদারণ পৃথিবীতে চল্লিশ হাজারেরও বেশি তাপ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করিয়েছে, ইলেকট্রনিক্স ঐ অস্ত্র ব্যবহারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণিত ও তার প্রয়োগ কৌশল মৃত্যুদূতের হাতে এনে দিয়েছে, মহাকাশ গবেষণার মধ্যে রয়েছে জ্ঞানের বিপরীতে আক্রমণের আয়ুধ-বিকাশের পরিকল্পনাও প্রাণীকুলকে নিঃশেষ করে কেবল ঐহিক সম্পদটুকু বাঁচাবার জন্য ঘাতকের নিউট্রনবোমা জীবনসংকেতকে ব্যবহার করতে চায় জীবনকেই নির্মূল করতে। এই এ বি সি অস্ত্রের উদ্ভাবন—অ্যাটমিক, ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ও কেমিক্যাল—আবার সিসিফাসকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে অতল খাদে, যেখানে আইনস্টাইনের ভাষায় পাথরের যুগ থেকে, যদি বেঁচে থাকে মানুষ, আবার শুরু করতে হবে। এই কি ভবিতব্য? মাথার উপরে ডিমোক্লিসের খড়্গ ঝুলিয়ে?

পৃথিবীময় শুরু হয়েছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা। অথচ কোটি কোটি পৃথিবীর শিশু

অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় অকালে ঝরে যাচ্ছে। অষ্টাদশ শতকে পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির মাথাপিছু আয় প্রায় একই ছিল। উনিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে তিনশো ডলারের মতো। ভারতের মতো দেশে উপনিবেশ শোষণে তা তখন একেবারে নিচু কোঠায়। এখন যে হারে ভারতে বিকাশ ঘটছে, সে হিসাবে বর্তমান মার্কিন গড় আয় সাড়ে তিন হাজার ডলারে পৌঁছতে আড়াই শো বছর লাগবে। অথচ ভারতের বিকাশও যাতে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তাই চাপ পড়েছে অস্ত্রসজ্জা করবার জন্য,নাকি আত্মরক্ষার প্রয়োজন। পাকিস্তানে বেয়নেটের সিংহাসনে আসীন সমরপ্রভু মার্কিন-চীন অস্ত্র পেয়ে এখন উল্লসিত। ভারত-সমুদ্রে দিয়েগো গার্সিয়ায় বসেছে তাপ পারমাণবিক অস্ত্রের মজুত-গুদাম। এই-যে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে এভাবে, নতুন জারেকসেসদের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনায়—এরাতো গণতন্ত্রের নামে আবার গলদশ্রু—দরিদ্র দেশ-গুলির বিকাশে এদের অবদান অকিঞ্চিৎকর কেন? এই মিদাসের হাত যেখানে পড়ে, অস্ত্র-সম্পদ ছড়িয়ে যায় বটে, কিন্তু পৃথিবীর শস্যশ্যামল প্রকৃতি, তার প্রাণীজগৎ আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে যায় সেই শস্ত্রপাণি সাক্ষাতে। পাকিস্তানে রয়েছে মহেঞ্জোদাড়ো—অর্থাৎ মৃতের স্তূপ। আবার কোন বৃহৎ মহেঞ্জোদাড়ো বানাবার চেষ্টা চলেছে তার বর্তমান সমরপ্রভু ও তার প্রভুকুলের। এশিয়ার দক্ষিণে এখন ঝড়ের মেঘ। পশ্চিমে তার বজ্রগর্জন। ইস্রায়েল থেকে, শাত-এল-আরবের সেই সভ্যতা বিকাশের ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস বিধৌত নদীসন্ধিতে, পাকিস্তানে তাপ পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনের গোপন প্রক্রিয়ায়,সব মিলিয়ে কোন লোহার হাতকড়া নিয়ে এ উপমহাদেশের দিকে পায়ে পায়ে এগোয় মানুষ ধরার দল। শিল্পী সে তো সেই এস্কিলাস-সোফোক্লেস-ইউরিপিদিস এর উত্তরসূরী। এই প্রকৌশলের হাতিয়ার বেঁধে ভয় দেখানো প্রাণঘাতকদের বিরুদ্ধে বিবেকের ডাকে সাড়া দেবে না মানুষ? বিজ্ঞানী তোমার গবেষণায় প্রাণের গভীর রহস্য, বস্তুর গোপন রহস্য, বিশ্ব চরাচরের অপার রহস্য উন্মোচনের দায়। মৃত্যুদূতদের কাছে তুমি ত্রিশ মুদ্রার বিনিময়ে মনুষ্যত্বকে বিক্রি কোরো না। শিল্পী, তুমি মানুষকে সুষম জগতের মানবিক সৌন্দর্যের পথ দেখাবে—তুমি জীবনের দাবিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধর। মানুষ, তুমি মানব জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে ঘাতকের হাত চেপে ধরো। না, আমরা চাই না পৃথিবী মহেঞ্জোদাড়োয় রূপান্তরিত হোক।

জাতি সংঘ ঘোষিত এই বিশ্ব প্রতিবন্ধী বছরে, সভ্যতার প্রতিবন্ধিত্ব ঘোচাবার দায় নিতে হবে তরুণ সমাজকে, প্রমিথিউসদের। বিশ্বজুড়ে বিকলাঙ্গ মানুষের ভিড় বাড়াবার জন্য আর নতুন যুদ্ধ, নতুন হিরোসিমা—নাগাসাকী আমরা চাই না। 'অ'—তার প্রথম পদক্ষেপে এ কথাগুলিই স্মরণ করে।

বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে পরিকল্পিত।

* * *

২০ খণ্ডে সমাপ্য। ১১টি খণ্ড প্রকাশিত। মোট মূল্য ৩৪৫ টাকা। গ্রাহক তালিকাভুক্তি কালে ২৫ টাকা এবং প্রতি খণ্ড সংগ্রহকালে ১৬ টাকা দিতে হবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মহাশ্বেতা সান্যাল কর্তৃক টি. এন. প্রিণ্টার্স, ২৬, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত এবং ৩১/২ ডঃ বীরেণ সেন সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য : এক টাকা